২.১ রূপকল্প (Vision)

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি লালনকারী সৎ, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, সৃজনশীল ও সুখী একটি প্রজন্ম তৈরির লক্ষ্যে রূপকল্পটি নির্ধারিত হয়েছে। এই রূপকল্পে এমন একটি প্রজন্মের স্বপ্ন দেখা হয়েছে, যারা স্বকীয়তা বজায় রেখে অপরের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে। একইসঙ্গে সৃজনশীলতা ও রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার সুফল নিশ্চিত করে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারবে। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে স্বাগত জানিয়ে অভিযোজনে সক্ষম বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প অর্জনে প্রয়োজন সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিছু কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি ও স্বীকৃতি প্রদান
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি নিয়োগ

২.৩ শিক্ষাক্রমের অ্যাপ্রোচ (Approach of the Curriculum)

বাংলাদেশের শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় অভিষেক ঘটে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তির মাধ্যমে। এখান থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করে একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করে বা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের যথাযথ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ ধারণায়ন (conceptualization) বা ধারণা তৈরি করা জরুরি।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, কৌশল ও গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে এবং অনুধাবন করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক সংজ্ঞার্থ এবং দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাকে নিম্নলিখিতভাবে ধারণায়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণাকে যেভাবে দেখা হয়েছে:

শিখন পরিবেশ: যেখানে শিক্ষার্থী নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিখন অভিজ্ঞতা এবং উপায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে এবং নিজের মতো তার প্রয়োগ ও প্রদর্শন করে প্রতিনিয়ত ক্ষমতায়িত হতে পারে।

শিখন সহায়তা: যেখানে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব শিখন চাহিদা অনুযায়ী সময়মত পৃথক বা সমন্বিত সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে পারে।

শিখন অংশগ্রহণ: যেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন পথে এবং ভিন্ন ভিন্ন গতিতে শিখতে পারে।

শিখন অগ্রগতি: যেখানে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ভিত্তি তার পারদর্শিতার রেকর্ড, শিখন সময় বা অংশগ্রহণের ধরন নয়।

শিখন মূল্যায়ন: যেখানে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর জন্য ইতিবাচক ও অর্থপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা যা সময়মতো শিখন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমভিত্তিক পারদর্শিতার প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

শিখন সমতা: যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের মধ্যে নিবিড়ভাবে বিদ্যমান থাকে।

শিখন প্রত্যাশা: স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ ও রূপান্তরযোগ্য।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের অনুঘটকসমূহ :

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়...

- প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় শিখন পরিবেশ ও সহায়তা পায় এবং অর্জিত যোগ্যতাসমূহ বাস্তব সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়।
- নিরাপদ ও নিজস্ব শিখন পরিবেশে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বোচ্চ চেষ্টার সুযোগ পায়।
- এখানে সকলের সংস্কৃতি ও মতামতের মূল্য দেয়ার ফলে শিক্ষার্থীর শিখনে দায়বদ্ধতা তৈরি হয়।
- এখানে সে এমন যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ও সহায়তা পায় যা তাকে স্বাধীনভাবে শিখনে উদ্বুদ্ধ করে।
- এখানে সমন্বিতভাবে যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থী তার প্রযোজন অনুযায়ী যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো সময়ে শেখার সুযোগ পায়, পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে এবং নিজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থী তার অগ্রগতি নিয়ে সময়মতো নির্দেশনা, সহায়তা ও ফলাবর্তন পায়।
- শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে মনোসামাজিক সহায়তা পায় যা তাকে শেখার ব্যক্তিগত পথ তৈরিতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন হয় শিখন যোগ্যতা ও পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে এবং এর উদ্দেশ্য হল শিখন যোগ্যতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীকে কোথায় কীভাবে কাজ করতে হবে তা জানার জন্য।
- শিক্ষার্থী পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে পরবর্তী ধাপের শিখনে অগ্রসর হতে পারে।

- শিক্ষাব্যবস্থা, কাঠামো, শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তাই সমন্বিত পরিবর্তন ও বাস্তবায়ন করা যেন কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়।
- সমতা বজায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন যেন শিখন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার মধ্য দিয়ে **সকল শিক্ষার্থী** পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশে শিখতে পারে।

- শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা অনুযায়ী যেন সকল শিক্ষার্থী শিখতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং বাধাঁপ্রাপ্ত হলেও আবার নিজের মত করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে শিখন-যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এরূপ ব্যবস্থা রাখা।
- শিখন-চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভাবনী ও কার্যকরী শিখন-পরিবেশ তৈরি করা যেন শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো বিভিন্ন উপায়, প্রক্রিয়া ও সময় ব্যবহার করে শিখতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন-যোগ্যতা যেন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখা।
- শিখন যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে অর্জিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- শিখন সহযোগিতামূলক এবং সামাজিকভাবে গ্রথিত করা যেন তা অনেক বেশি গভীর হয় ।

শিক্ষা থেকে প্রত্যাশা স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য করা যেন উন্নত-শিখন সংস্কৃতি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

২.৫ মূলনীতি

অভিলক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম রূপরেখার রূপকল্পকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কিছু মূলনীতি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই মূলনীতিসমূহ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে, সেগুলো হলো:

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ
- একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক
- বৈষম্যহীন
- বহুমাত্রিক
- যোগ্যতাভিত্তিক
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক
- প্রাসঙ্গিক ও নমনীয়
- জীবন ও জীবিকা-সংশ্লিষ্ট
- অংশগ্রহণমূলক
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময়

২.৬ মূল যোগ্যতা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে দশটি মূল যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন, নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে দূর্যোগ মোকাবিলা করতে পারা এবং নিরাপদ, সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেই অনুযায়ী যোগ্যতার মূল চারটি উপাদান আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো : জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। উপর্যুক্ত দশটি মূল যোগ্যতায় ইতোমধ্যে নির্ধারিত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। যোগ্যতার সকল উপাদান অর্জন নিশ্চিত করতে শুধু শিখন-ক্ষেত্র এবং নির্দিষ্ট বিষয়গুচ্ছ নয়, বরং শিখন-প্রক্রিয়া কেমন হবে তারও দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জগতে কোনো বিষয়ই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না, বরং একে অপরের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকে। তাই কোনো বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শিখন পরিপূর্ণ হয় না। এই উপলব্ধি থেকে এই রূপরেখায় শিখনের ক্ষেত্রে ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

২.৭ শিখন-ক্ষেত্র

শিক্ষাক্রমের দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের দশটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্র, পূর্বে নির্ধারিত নীতি, মূল্যবোধ, মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় পর্যালোচনাসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ শিখন-বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে। এই নির্বাচনের সময় স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন চাহিদা ও প্রেক্ষাপট যেমন বিবেচনা করা হয়েছে, একই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে একাডেমিক অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মজগতের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিপ্রেক্ষিত।

যোগ্যতাগুলো অর্জনকল্পে শিক্ষাক্রমে যেসকল শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো :

১. ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication),
২. গণিত ও যুক্তি (Mathematics & Reasoning),

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology),
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি (Digital Technology)
৫. পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment & Climate),
৬. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব (Society & Global Citizenship),
৭. জীবন ও জীবিকা (Life & Livelihood),
৮. ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Religion, Values & Morality),
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (Physical & Mental Health and Protection),
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি (Arts & Culture)

২.৮ শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা

শিক্ষাক্রমে যে দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখন-ক্ষেত্র এবং তার চাহিদা ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলো হলো -

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
১. ভাষা ও যোগাযোগ	একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া; বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।
২. গণিত ও যুক্তি	সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (Operation), গণনা, জ্যামিতিক পরিমাপ এবং তথ্য বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ ফলাফল ও করণীয় জেনে যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ করতে পারা। এছাড়াও সৃজনশীলতার সঙ্গে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যৌক্তিক, কল্যাণকর সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করতে পারা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফলাফল, তাৎপর্য ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারা।
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি	তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার অভিনব ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারা।

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
৫. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব	নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ও অন্যের মতামত বিবেচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখা।
৬. জীবন ও জীবিকা	ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও টেকসই প্রাক-কর্ম যোগ্যতা অর্জন করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা। কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখীতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা। পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে পারা এবং কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জন করে নিজ ও সকলের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৮. ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা।
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ, শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার রস আস্বাদন করতে পারা, চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো; সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ এবং নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিল্পকলাকে উপজীব্য করে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

২.৯ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের উদ্দেশ্য

শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রতিটি স্তরের কিছু সার্বজনীন এবং কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। সার্বজনীন উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষিক, নান্দনিক তথা সার্বিক বিকাশ– যা শিক্ষার সব স্তরেই গুরুত্ব পায়। তবে প্রাক-শৈশব, শৈশব, কৈশোর এবং কৈশোর-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, পরিপক্বতা ও মিথষ্ক্রিয়ার ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের বিকাশ ও শিখনের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই শিক্ষার নির্দিষ্ট পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী একেকটি নির্দিষ্ট চাহিদাকে কেন্দ্র করে বিবেচনা করা হয়। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্তরের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় নেয়া হয়, যা ধাপে ধাপে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন : প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য থাকে বাড়ির চেনা পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যা শিশুর সার্বিক বিকাশের ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আবার প্রাথমিক স্তরে মূলত গুরুত্ব আরোপ করা হয় পড়তে, লিখতে ও গুণতে শেখার মতো মৌলিক বা ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের উপর যা ব্যবহার করে শিশু পরবর্তী স্তরে নানাবিধ যোগ্যতা অর্জন ও স্বশিখন অব্যাহত রাখতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে এসে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন ভিত্তিমূলক দক্ষতা দৃঢ় করার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন অব্যাহত রাখবে, তেমনি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে যা তাকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে ক্রমশ ক্রিয়াশীল হতে সহায়তা করবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও তৎপরবর্তী সময়ে সে বিশেষায়িত ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

উক্ত শিক্ষাক্রমে ব্যক্তিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধরন ও চাহিদার পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্তরভিত্তিক যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিচের চিত্রে উপস্থাপিত হলো।

এখানে আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি স্তরে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেয়া হলেও, এই স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহ শুধু সংশ্লিষ্ট স্তরেই অর্জিত হবে এমন নয়, বরং প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরেই তা নিহিত থাকবে।